আল মুমতাহিনা

৬০

নামকরণ

যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে চলে আসবে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করবে এ সূরার ১০ আয়াতে তাদের পরীক্ষা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমতাহিনা। মুমতাহানা এবং মুমতাহিনা এই দু'ভাবেই শব্দটি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, যে স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় এমন দু'টি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে যার সময়–কাল ঐতিহাসিকভাবে জানা। প্রথমটি হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর (রা) ঘটনা। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে একটি গোপন পত্রের মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের এ মর্মে অবগত করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি মুসলমান মহিলাদের সম্পর্কে, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় আসতে শুরু করেছিল এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, সন্ধির শর্ত অনুসারে মুসলমান পুরুষদের মত তাদেরও কি কাফেরদের হাতে সোপর্দ করতে হবে? এ দু'টি ঘটনার উল্লেখ থেকে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল। এ দু'টি ঘটনা ছাড়াও সূরার শেষের দিকে তৃতীয় আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তাহলো, ঈমান গ্রহণের পর বাই'য়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহিলারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হবে তখন তিনি তাদের কাছ থেকে কি কি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নেবেন? সূরার এ অংশ সম্পর্কেও অনুমান হলো, তা মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কারণ মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের পুরুষদের মত তাদের নারীরাও বিপুল সংখ্যায় একসাথে ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে হচ্ছিলো। তাদের নিকট থেকে সামষ্টিকভাবে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন তখন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির তিনটি অংশ ঃ

প্রথম অংশ সূরার শুরু থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত। সূরার সমাপ্তি পর্বের ১৩নং আয়াতটিও এর সাথে সম্পর্কিত। হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ শুধু তার পরিবার–পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি

গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এটি যথাসময়ে ব্যর্থ করে দেয়া না গেলে মক্কা বিজয়ের সময় ব্যাপক রক্তপাত হতো। মুসলমানদেরও বহু মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হতো এবং কুরাইশদেরও এমন বহু লোক মারা যেতো, যাদের দ্বারা পরবর্তী সময়ে ইসলামের ব্যাপক খেদমত পাওয়ার ছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মক্কা বিজিত হলে যেসব সুফল অর্জিত হতে পারতো তা সবই পণ্ড হয়ে যেতো। এসব বিরাট ও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো শুধু এ কারণে যে, মুসলমানদেরই এক ব্যক্তি যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজের সন্তান-সন্ততিকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল। এ আয়াতে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর এ কাজের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মারাত্মক এই ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন ঈমানদারের কোন অবস্থায় কোন উদ্দেশ্যেই ইসলামের শত্রু কাফেরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখা উচিত এবং এমন কোন কাজও না করা উচিত যা কুফর ও ইসলামের সংঘাতে কাফেরদের জন্য সুফল বয়ে আনে। তবে যেসব কাফের কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক ও নির্যাতনমূলক কোন আচরণ করছে না তাদের সাথে প্রীতিপূর্ণ ও অনুগ্রহের আচরণ করায় কোন দোষ নেই।

১০ ও ১১ আয়াত হলো, সূরাটির দ্বিতীয় অংশ। সেই সময় মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করছিল এমন একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে এ অংশে। মক্কায় বহু মুসলমান মহিলা ছিল যাদের স্বামীরা ছিল কাফের। এসব মহিলা কোন না কোনভাবে হিজরাত করে মদীনায় এসে হাজির হতো। অনুরূপ মদীনায় বহুসংখ্যক মুসলমান পুরুষ ছিল যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের এবং তারা মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিল। এসব লোকের দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুণ্ন আছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিতো। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে চিরদিনের জন্য ফায়সালা দিলেন যে, মুসলমান নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলমান পুরুষের জন্যও মুশরিক স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে ধরে রাখা জায়েয নয়। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ফলাফলের ধারক। পরে আমরা টীকাসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১২নং আয়াত হলো সূরাটির তৃতীয় অংশ। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী যুগের আরব সমাজে যেসব বড় বড় দোষ-ত্রুটি ও গোনাহর কাজ নারীসমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল যেসব নারী ইসলাম গ্রহণ করবে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে এবং এ বিষয়েও অঙ্গীকার নিতে হবে যে, আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে যেসব কল্যাণ ও সুকৃতির পথ, পন্থা ও নিয়ম-কানুন মেনে চলার আদেশ দেয়া হবে তা তারা মেনে চলবে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ①

হে[১] ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে (জন্মভূমি ছেড়ে ঘর থেকে) বেরিয়ে থাক তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা কর, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের আচরণ হলো, তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এই অপরাধে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো। তোমরা গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বমূলক পত্র পাঠাও। অথচ তোমরা গোপনে যা কর এবং প্রকাশ্যে যা করো তা সবই আমি ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিতভাবেই সে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১. যেসব ঘটনা প্রসংগে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে শুরুতেই তা বিস্তারিত বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এতে পরবর্তী বিষয়বস্তু বুঝা সহজ হবে। মক্কার মুশরিকদের কাছে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর (রা) লিখিত পত্র ধরা পড়ার পর এ

আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। সমস্ত তাফসীরকার এ ব্যাপারে একমত। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, উরওয়া ইবনে যুবায়ের প্রমুখ বর্ণনাকারীর সর্বসম্মত বর্ণনাও তাই।

ঘটনা হলো, কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম মক্কার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কিন্তু কোথায় অভিযান পরিচালনা করতে চাচ্ছেন বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবা ছাড়া আর কাউকে তিনি তা বললেন না। ঘটনাক্রমে এই সময় মক্কা থেকে একজন মহিলা আসল। পূর্বে সে আবদুল মুত্তালিবের দাসী ছিল। কিন্তু পরে দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে গানবাদ্য করে বেড়াত। নবীর(সা) কাছে এসে সে তার দারিদ্র্যের কথা বলল এবং কিছু অর্থ সাহায্য চাইল। তিনি বনী আবদুল মুত্তালিব এবং বনী মুত্তালিবের লোকদের কাছে থেকে কিছু অর্থ চেয়ে দিয়ে তার অভাব পূরণ করলেন। সে মক্কায় ফিরে যেতে উদ্যত হলে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ তার সাথে দেখা করলেন এবং মক্কার কয়েকজন কাফের নেতার নামে লেখা একখানা পত্র গোপনে তাকে দিলেন। আর সে যাতে এই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ না করে এবং গোপনে তাদের কাছে পৌছে দেয় সে জন্য তিনি তাকে দশটি দিনারও দিলেন। সে সবেমাত্র মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আলী, হযরত যুবায়ের এবং হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে তার সন্ধানে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও। রাওদায়ে খাখ নামক স্থানে (মদীনা থেকে মক্কার পথে ১২ মাইল দূরে) তোমরা এক মহিলার সাক্ষাত পাবে। তার কাছে মুশরিকদের নামে হাতেবের একটি পত্র আছে। যেভাবে হোক তার নিকট থেকে এ পত্রখানা নিয়ে এসো। সে যদি পত্রখানা দিয়ে দেয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। আর যদি না দেয় তাহলে তাকে হত্যা করবে। তাঁরা ঐ স্থানে পৌছে মহিলাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তার কাছে পত্রখানা চাইলেন। কিন্তু সে বললঃ আমার কাছে কোন পত্র নেই। তাঁরা তার দেহ তল্লাশী করলেন। কিন্তু কোন পত্র পাওয়া গেল না। অবশেষে তারা বললেন ঃ পত্রখানা আমাদের দিয়ে দাও তা না হলে আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী নেব। সে যখন বুঝতে পারলো রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই তখন সে তার চুলের খোপার ভেতর থেকে পত্রখানা বের করে তাদের দিল। আর তাঁরা তা নিয়ে নবীর (সা) দরবারে হাজির হলেন। পত্রখুলে পড়া হলো। দেখা গেল তাতে কুরাইশদের অবগত করানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। (বিভিন্ন বর্ণনায় পত্রের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণিত হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল এটিই) নবী (সা) হযরত হাতেবকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি একি করেছো? তিনি বললেন ঃ আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি যা করেছি তা এ জন্য করি নাই যে, আমি কাফের বা মুরতাদ হয়ে গিয়েছি এবং ইসলামকে পরিত্যাগ করে এখন কুফরকে ভালবাসতে শুরু করেছি। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার আপনজনেরা সব মক্কায় অবস্থান করছে। আমি কুরাইশ গোত্রের লোক নই। বরং কুরাইশদের কারো কারো পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্রছায়ায় আমি সেখানে বসতিস্থাপন করেছিলাম। অন্য যেসব মুহাজিরের পরিবার-পরিজন মক্কায় অবস্থান করছে তাদের গোত্র তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার মত কেউই সেখানে নেই। তাই আমি এই পত্র লিখেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, এটা হবে কুরাইশদের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের কথা মনে করে তারা আমার

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ② لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③

তাদের আচরণ হলো, তারা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে তাহলে তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে এবং হাত ও জিহবা দ্বারা তোমাদের কষ্ট দেবে। তারা চায় যে, কোনক্রমে তোমরা কাফের হয়ে যাও।[২] কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন কোন কাজে আসবে না সন্তান-সন্ততি[৩] কোন কাজে আসবে। সেদিন আল্লাহ তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।[৪] আর তিনিই তোমাদের আমল বা কর্মফল দেখবেন।[৫]

সন্তানদের ওপর নির্যাতন চালাবে না। (হযরত হাতেবের পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন যে, ঐ সময় হযরত হাতেবের সন্তান-সন্ততি ও ভাই মক্কায় অবস্থান করছিল। তাছাড়া হযরত হাতেবের নিজের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় সেসময় তাঁর মাও সেখানে ছিল।) হাতেবের এই বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সবাইকে বললেন ঃ قد صدقكم হাতেব তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। অর্থাৎ এটিই তার এ কাজের মূল কারণ। ইসলামকে পরিত্যাগ বা কুফরকে সহযোগিতা করার মানসিকতা এর চালিকাশক্তি নয়। হযরত উমর উঠে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করি। সে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নবী (সা) বললেন, এ ব্যক্তি তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তোমরা তো জানো না, হয়তো আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের বিষয় বিবেচনা করে বলে দিয়েছেন ঃ তোমরা যাই করো না কেন আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। (শেষ বাক্যাংশটির ভাষা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোনটাতে আছে قد غفرت لكم 'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' কোনটাতে আছে انى غافر لكم 'আমি তোমাদের মাফ করে দেব।' আবার কোনটাতে আছে سأغفر لكم 'আমি অচিরেই তোমাদের মাফ করে দেব') একথা শুনে হযরত 'উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাধিক জানেন। এ হলো বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, তাবারী, ইবনে হিশাম, ইবনে হিব্বান এবং ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীসের সার সংক্ষেপ। এসব বর্ণনার মধ্যে যে বর্ণনাটি হযরত আলীর নিজের মুখ থেকে তাঁর সেক্রেটারী উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে শুনেছেন এবং তার নিকট থেকে হযরত আলীর (রা) পৌত্র হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানফীয়া শুনে পরবর্তী রাবীদের কাছে পৌঁছিয়েছেন সেটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। এসব বর্ণনার কোনটিতেই স্পষ্ট করে একথা বলা হয়নি যে, হযরত হাতেবের এই ওজর শোনার পর তাকে মাফ করে দেয়া

হয়েছিল। আবার কোন সূত্র থেকে একথাও জানা যায় না যে, তাঁকে কোন শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাই আলেমগণ ধরে নিয়েছেন হযরত হাতেবের ওজর গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

২. এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে এবং পরে যা বলা হবে যদিও তা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ছিল হযরত হাতেবের ঘটনা, কিন্তু মহান আল্লাহ কেবল তার ব্যাপারে কথা বলার পরিবর্তে এর মাধ্যমে সমস্ত ঈমানদারদের চিরদিনের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, যেখানে কুফর ও ইসলামের মোকাবিলা এবং যেখানে কিছু লোক ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের মুসলমান হওয়ার কারণে শত্রুতা করছে সেখানে কোন ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য বা কোন যুক্তির খাতিরেও এমন কোন কাজ করা যা দ্বারা ইসলামের স্বার্থের ক্ষতি এবং কুফর ও কাফেরদের স্বার্থের আনুকূল্য হয়, ঈমানের পরিপন্থি আচরণ। কারো মধ্যে যদি ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও ক্ষতি করার মানসিকতা একেবারেই না থাকে এবং সে খারাপ নিয়তে নয় বরং নিছক নিজের একান্ত কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই এরূপ কাজ করে বসে তবুও তা কোন ঈমানদারের জন্য যোগ্য ও শোভনীয় কাজ নয়। এ ধরনের কাজ যেই করে থাকুক না কেন সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

৩. এখানে হযরত হাতেবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর মা, ভাই এবং সন্তান–সন্ততিকে যুদ্ধের সময় শত্রুর নির্যাতন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছিলেন। তাই বলা হচ্ছে, যাদের জন্য তুমি এত বড় অপরাধ করে বসলে কিয়ামতের দিন তারা তোমাকে রক্ষা করতে আসবে না। আল্লাহর আদালতে এগিয়ে গিয়ে কারো একথা বলার সাহস হবে না যে, আমার বাপ, আমার মা অথবা আমার ভাই আমার জন্য এ গোনাহ করেছিল। তাই তার জন্য যে শাস্তি হওয়ার তা আমাকে দেয়া হোক। সেদিন প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অন্য কারো পরিণাম বা কর্মফল ভোগ করতে প্রস্তুত হওয়া তো দূরের কথা নিজের কৃতকর্মের পরিণাম থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, সেই ভাবনাতেই সবাই থাকবে দিশেহারা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় একথাটিই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে, "অপরাধী সেদিন কামনা করবে, যদি তার সন্তান–সন্ততি, স্ত্রী, ভাই এবং সাহায্যকারী নিজ বংশ এবং গোটা পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময়ে দিয়েও যদি সে এ আযাব থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে তাহলে তা সে দেবে এবং নিজে মুক্তি লাভ করবে।" (আল মা'আরিজ, আয়াত ১১—১৪) আরেক স্থানে বলা হয়েছে, "সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা, নিজের বাপ, নিজের স্ত্রী এবং নিজের ছেলেমেয়ের কাছ থেকে পালাবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, হুশই থাকবে না। (আবাসা, ৩৪—৩৭)।

৪. অর্থাৎ সেখানে দুনিয়ার সব রকম আত্মীয়তা, সম্পর্ক এবং বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া হবে। দল, পার্টি এবং বংশ বা গোত্র হিসেবে মানুষের হিসেব–নিকেশ হবে না। বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে পেশ করা হবে এবং তাকে কেবল তার নিজের হিসেবই দিতে হবে। তাই কোন আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা যুথবদ্ধতার খাতিরে কারো কোন নাজায়েয কাজ করা উচিত নয়। কারণ কৃতকর্মের শাস্তি তার নিজেকেই ভোগ করতে হবে অন্য কেউ তার ব্যক্তিগত দায়–দায়িত্বের অংশীদার হবে না।

৫. হযরত হাতেব সম্পর্কিত এই ঘটনাটির বিস্তারিত যে বিবরণ আমরা উপরে পেশ করেছি তা থেকে এবং ঐ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ এসব আয়াত থেকে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত ও ফলাফল পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ কাজ যিনি করেছেন তিনি কি নিয়তে করেছেন সে বিষয়টি বাদ দিলেও এ কাজটি ছিল স্পষ্টত গুপ্তচরবৃত্তি তাও আবার অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে চরম বিপজ্জনক প্রকৃতির গুপ্তচরবৃত্তি। অর্থাৎ আক্রমণের ঠিক পূর্বক্ষণে বে-খবর শত্রুকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া ব্যাপারটা শুধু সন্দেহের পর্যায়ে ছিল না। অভিযুক্তের নিজ হাতে লেখা পত্রও ধরা পড়েছিল। তাই আর কোন প্রমাণেরও প্রয়োজন ছিল না তখন শান্তিকালীন অবস্থা ছিল না, যুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজ করছিল। তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম হাতেবকে সাফাই ও নির্দোষিতা প্রমাণ করার সুযোগ না দিয়ে গ্রেফতার করলেন না। আর কোন রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাকে সাফাই পেশ করতে বলা হয়নি। বরং উন্মুক্ত আদালতে সবার সামনে সাফাই পেশ করতে দিয়েছেন। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায়, ইসলামে এমন কোন আইন-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতির আদৌ কোন অবকাশ নেই যার ভিত্তিতে শাসক শুধু নিজের অবগতি ও সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কোন অবস্থায় কাউকে গ্রেফতার করার অধিকার রাখে। তাছাড়া বদ্ধ কামরায় গোপনপন্থায় কারো বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর কোন বিধানও ইসলামে নেই।

দুই ঃ হযরত হাতেব শুধু মুহাজিরই ছিলেন না। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাহাবীদের মধ্যেও তার একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এত বড় অপরাধ করে ফেলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে অত্যন্ত কঠোরভাবে তার সমালোচনা করেছেন যা উপরোল্লেখিত আয়াত থেকে জানা যেতে পারে। বিভিন্ন হাদীসেও তার এ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাফসীরকারদের মধ্যে এ ঘটনার উল্লেখ করেননি এমন তাফসীরকার নেই বললেই চলে। সাহাবায়ে কেরাম যে নির্ভুল ও নিষ্পাপ নন এটি তার বহু সংখ্যক প্রমাণের একটি। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাঁদের দ্বারাও ভুল-ক্রটি হতে পারে এবং কার্যত হয়েছেও। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাহাবীদের প্রতি সম্মান দেখানোর যে শিক্ষা দিয়েছেন তার দাবী কখনো এ নয় যে, তাদের কারো দ্বারা কোন ভুল-ক্রটি হয়ে থাকলে তার উল্লেখ করা যাবে না। তাই যদি হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে তার উল্লেখ করতেন না এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, মুফাস্সির এবং মুহাদ্দিসগণও তাঁদের রেওয়ায়াতসমূহে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতেন না।

তিন ঃ হযরত হাতেবের ঘটনায় হযরত উমর (রা) যে অভিমত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল হযরত হাতেবের কাজের বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। হযরত উমরের যুক্তি ছিল, এটি এমন একটি কাজ যা সরাসরি আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। অতএব হাতেব মুনাফিক এবং হত্যার উপযুক্ত। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ইসলামী শরীয়াতের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বললেন ঃ কাজের বাহ্যিক অবস্থা বিচার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। বরং এও দেখা উচিত যে, যে ব্যক্তির দ্বারা কাজটি সংঘটিত হয়েছে তার অতীত জীবন এবং সার্বিক স্বভাব-চরিত্র কেমন। তার চাল-চলন

কিসের ইংগিত দেয়। নিসন্দেহে কাজটির বাহ্যিক রূপ ছিল গুপ্তচরবৃত্তি। কিন্তু কাজটি যিনি করেছেন ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে তার আজ পর্যন্তকার আচরণ কি একথাই বলে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নিয়তে এ কাজ করতে পারে? যাঁরা ঈমান রক্ষার কারণে হিজরাত করেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছাড়া কি তিনি এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন? বদর যুদ্ধের মত নাজুক পরিস্থিতিতেও যখন শত্রুর তিনগুণ এবং অনেক বেশী ও ব্যাপকভাবে অস্ত্রসজ্জিত শক্তির সাথে মোকাবিলা হতে যাচ্ছিল—তখন ঈমানের খাতিরে তিনি জীবন বাজি রেখেছিলেন। এমন ব্যক্তির নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা কি সন্দেহযুক্ত হতে পারে? অথবা তাঁর সম্পর্কে কি একথা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, তাঁর অন্তরে কুরাইশ কাফেরদের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ ও সহানুভূতি থাকতে পারে? তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় তাঁর কাজের কারণ তুলে ধরেছেন এই বলে যে, মক্কায় তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য বংশ ও গোত্রের এমন কোন নিরাপত্তা ব্যূহ নেই যা অন্য মুহাজিরদের আছে। তাই যুদ্ধের সময় তাদেরকে শত্রুর নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এ কাজ করেছেন। মক্কায় যে তাঁর কোন আপন গোত্র নেই, বাস্তব অবস্থাও তার প্রমাণ এবং একথাও সবার জানা যে, তাঁর সন্তান-সন্ততি সেখানেই অবস্থান করছে। তাই তাঁর এ বক্তব্য মিথ্যা মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া তাঁর সম্পর্কে এ অভিমত পোষণ করা এবং তাঁর এ বক্তব্য যে তাঁর কাজটির মূল কারণ নয়, বরং তাঁর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্য কাজ করছিল, সেরূপ মনে করার কোন সংগত যুক্তি নেই। তথাপি নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে শত্রুদেরকে মুসলমানদের সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা সদুদ্দেশ্যে হলেও একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের জন্য এরূপ কাজ ও আচরণ জায়েয নয়। কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকের ত্রুটি এবং মুনাফিকের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। শুধু কাজের ধরন ও প্রকৃতি দেখে উভয়ের একই শাস্তি হতে পারে না। আলোচ্য মোকদ্দমায় এটি ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত। সূরা মুমতাহিনার এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ওপরের তিনটি আয়াত পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এসব আয়াতে হযরত হাতেবকে তিরস্কার করা হয়েছে ঠিকই; তবে একজন মু'মিনকে তিরস্কারের ধরন যা হয়ে থাকে এটা ঠিক সেই ধরনের তিরস্কার। কোন মুনাফিকের জন্য যে ধরনের তিরস্কার হয়ে থাকে এটা ঠিক তা নয়। তাছাড়া তাঁকে কোন আর্থিক বা শারীরিক শাস্তি দেয়া হয়নি। বরং প্রকাশ্যে কঠোর তিরস্কার, সমালোচনা ও শাসনবাণী শুনিয়েই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তার অর্থ, মুসলিম সমাজে একজন অপরাধী ঈমানদারের মর্যাদাহানি হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াও তার জন্য একটি বড় শাস্তি।

চার ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি ঃ তুমি তো জান না, আল্লাহ তা'আলা হয়তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দেখে বলে দিয়েছেন ঃ তোমরা যাই কর না কেন, আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি"— এর অর্থ এ নয় যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সাত খুন মাফ করে দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে যে গোনাহ ও অপরাধই তারা করতে চাইবে তা করার অবাধ স্বাধীনতা তাদের দেয়া হয়েছে। এসব অপরাধ ক্ষমা করার অগ্রিম নিশ্চয়তা

তারা লাভ করেছেন তা বুঝাতে নবী (সা) একথাটি বলেননি, কোন সাহাবীও কোন সময় একথার এ অর্থ গ্রহণ করেননি, এ সুসংবাদ শুনে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবীও যে কোন গোনাহর কাজ করার ব্যাপারে নিজেকে স্বাধীন মনে করেননি এবং ইসলামী শরীয়াতও এর ভিত্তিতে এমন কোন ফর্মুলা তৈরী করেনি যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবীর দ্বারা যদি কোন অপরাধ সংঘটিত হয় তাহলে তাকে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষেত্র ও পরিবেশে কথাটা বলা হয়েছিল সেই ক্ষেত্র ও পরিবেশ এবং নবী (সা) যে কথাটি বলেছিলেন সেই কথাটি সম্পর্কে যদি চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করা যায় তাহলে এর যে স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় তাহলো, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য নিষ্ঠা, কুরবানী এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার এত বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের আগের ও পরের সব গোনাহ মাফ করে দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের এই খেদমত এবং আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পার প্রতি লক্ষ করলে তা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অতএব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবী সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফেকীর সন্দেহ করো না। অপরাধের যে কারণ সে নিজে বর্ণনা করছে তা গ্রহণ করো।

পাঁচ ঃ কুরআন মজীদ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফেরদের জন্য কোন মুসলমানের গোয়েন্দাগিরি করাটাই তার মুরতাদ, বেঈমান অথবা মুনাফিক হয়ে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যদি অন্য কোন সাক্ষ-প্রমাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। তা নাহলে এটি নিছক একটি অপরাধমূলক কাজ, কুফরীমূলক কাজ নয়।

ছয় ঃ কুরআন মজীদের এই আয়াত থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাফেরদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের গোয়েন্দাগিরি করা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। এতে কারো নিজের কিংবা তার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ ও সম্পত্তি যত কঠিন বিপদের মুখোমুখিই হোক না কেন।

সাত ঃ হযরত উমর (রা) যখন হযরত হাতেবকে গোয়েন্দাগিরির অপরাধে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন তখন তার জবাবে নবী (সা) একথা বলেননি যে, এ ধরনের অপরাধ হত্যাযোগ্য অপরাধ নয়। বরং তিনি হত্যা করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন এ জন্য যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হাতেবের নিষ্ঠা ও সৎনিয়তের স্পষ্ট প্রমাণ। তার এ বক্তব্যও সত্য যে, তিনি শত্রুদের কল্যাণ কামনায় নয়, বরং নিজের সন্তান-সন্ততিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ কাজ করেছিলেন। এ ঘটনা থেকে একদল ফকীহ প্রমাণ পেশ করেছেন যে, মুসলিম গুপ্তচরদের হত্যা করাই হলো সাধারণ আইন। তবে যদি অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ বর্তমান থাকে তাহলে তাকে ন্যূনতম শাস্তি দিয়ে কিংবা শুধু তিরস্কার করে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এবং অপর কিছুসংখ্যক ফিকাহবিদদের মত হলো, মুসলিম গুপ্তচরদের তাযীর করতে হবে। কিন্তু তাকে হত্যা করা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম আওযায়ী বলেন ঃ তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখার শাস্তি দিতে হবে। ইমাম মালেক বলেনঃ তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মালেকী ফকীহদের বক্তব্য ভিন্নরূপ। আশহাব

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهٗ ۚ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ বর্তমান। তিনি তাঁর কওমকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন ঃ আমরা তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে যেসব উপাস্যের উপাসনা তোমরা করে থাক তাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট। আমরা তোমাদের অস্বীকার করেছি।[৬] আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে— যতদিন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। তবে ইবরাহীমের তার বাপকে একথা বলা (এর অন্তরভুক্ত নয়) "আমি আপনার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তবে আল্লাহর নিকট থেকে আপনার জন্য নিশ্চিত কোন কিছু অর্জন করে নেয়া আমার আয়ত্বাধীন নয়।"[৭] (ইবরাহীম ও ইবরাহীমের দোয়া ছিল ঃ) হে আমাদের রব, তোমার ওপরেই আমরা ভরসা করেছি, তোমার প্রতিই আমরা রুজু করেছি আর তোমার কাছেই আমাদের ফিরে আসতে হবে।

বলেন ঃ এ ব্যাপারে ইমাম ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। অপরাধ এবং অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করে তিনি তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। ইমাম মালেক (র) এবং ইবনুল কাসেমের একটি মতও তাই। ইবনুল মাজেশুন এবং আবদুল মালেক ইবনে হাবীব বলেন, গুপ্তচরবৃত্তি যদি অপরাধীর স্বভাবে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। ইবনে ওয়াহাব বলেন ঃ গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি মূলত মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সে যদি এ কাজ থেকে তাওবা করে তাহলে তাকে মাফ করা যেতে পারে। সাহনূন বলেন ঃ তাওবার ক্ষেত্রে তার তাওবা সত্যিকার তাওবা না ধোঁকাবাজি তা কিভাবে নিরূপণ করা যাবে? তাই তাকে হত্যা করাই উচিত। ইবনুল কাসেমের একটি মত এ বক্তব্যকে সমর্থন করে। আসবাগ বলেন ঃ হারবী বা যুদ্ধরত জাতির গুপ্তচরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু মুসলিম ও যিম্মী গুপ্তচরকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে শাস্তি দিতে হবে। তবে সে যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের খোলাখুলি সাহায্য করে তাহলে ভিন্ন কথা। (আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী, উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী)।

আট ঃ উল্লেখিত হাদীস থেকে এ বিষয়ের বৈধতা লাভ করা যায় যে, অপরাধের তদন্ত বা অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন হলে শুধু অভিযুক্ত পুরুষকেই নয়, স্ত্রীলোককেও উলঙ্গ করা যেতে পারে। হযরত আলী (রা), হযরত যুবায়ের (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা) যদিও মহিলাটিকে উলঙ্গ করেননি, কিন্তু পত্র না দিলে তাঁরা তাকে তার কাপড় খুলে তল্লাশী চালাবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। এ কাজটি যদি বৈধ না হতো তাহলে এ তিনজন সম্মানিত সাহাবী এ কাজ করার ভয় দেখাতে পারতেন না। এ ক্ষেত্রে যুক্তির দাবী হলো, তারা ফিরে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁদের অভিযানের কাহিনী অবশ্যই শুনিয়ে থাকবেন। নবী (সা) তাদের এ কাজ অপছন্দ করে থাকলে বা এ কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকলে তা অবশ্যই বর্ণনা সূত্রে আমরা লাভ করতাম। এ কারণে ফকীহগণ এ ধরনের কাজ বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। (উমদাতুল কারী)

৬. অর্থাৎ আমরা তোমাদের অস্বীকারকারী। আমরা তোমাদেরকে সত্যপথের অনুসারী বলে মানি না এবং তোমাদের দীনকেও সত্য দীন বলে স্বীকার করি না। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অপরিহার্য দাবী হলো তাগুতের সাথে কুফরী করা।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا –

"যে ব্যক্তি তাগুতের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে যা ছিন্ন হবার নয়।" (আল বাকারাহ ২৫৬)

৭. অন্য কথায় এর অর্থ হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর কাফের ও মুশরিক কওমের প্রতি যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং পরিষ্কার ভাষায় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে ঘোষণা করেছিলেন তা তোমাদের জন্য অনুসরণীয়। কিন্তু তিনি তাঁর মুশরিক পিতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার যে ওয়াদা করেছিলেন এবং কার্যত তা করেছিলেন, তার মধ্যে তোমাদের জন্য অনুসরণীয় কিছু নেই। কারণ কাফেরদের সাথে ভালবাসা ও সহানুভূতির সামান্যতম সম্পর্ক রাখাও ঈমানদারদের জন্য ঠিক নয়। সূরা তাওবায় (১১৩ আয়াত) আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِىْ قُرْبٰى –

"যত নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন মুশরিকদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা কোন নবীর কাজ নয় এবং ঈমানদারদের জন্যও তা শোভনীয় নয়"।

তাই হযরত ইবরাহীম এ কাজ করেছিলেন এই যুক্তি দেখিয়ে কোন মুসলমানই তার কাফের নিকটাত্মীয়দের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে না। এখন কথা হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজে কিভাবে এ কাজ করলেন? আর তিনি কি তাঁর এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? এ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব আমরা কুরআন মজীদ থেকেই পেয়ে যাই। তাঁর বাপ যে সময় তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন তখন বিদায় বেলায় তিনি বলেছিলেনঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ –

"আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার রবের কাছে আপনার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো।" (মারয়াম, ৪৭)

এই প্রতিশ্রুতির কারণে তিনি দুইবার তাঁর পিতার জন্য দোয়া করেছেন। এর একটি দোয়ার উল্লেখ আছে সূরা ইবরাহীমে (আয়াত, ৪১) ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ –

"হে আমাদের প্রতিপালক যেদিন হিসেব নেয়া হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সমস্ত ঈমানদারকে মাফ করে দিও।"

দ্বিতীয়বার দোয়ার উল্লেখ আছে সূরা শু'আরাতে (আয়াত, ৮৬-৮৭)ঃ

وَاغْفِرْ لِاَبِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ – وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ –

"আমার পিতাকে ক্ষমা করে দিন। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত। আর যেদিন মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না।"

কিন্তু পরে যখন তিনি বুঝতে পারলেন, যে পিতার ক্ষমা চেয়ে তিনি দোয়া করছেন সে আল্লাহর দুষমন তখন তিনি তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেলেন এবং তার সাথে ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্কও ছিন্ন করলেন।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۚ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ – (التوبه : ١١٤)

"আর ইবরাহীমের তার পিতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করার কারণ তার পিতাকে দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতপর তাঁর কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও নম্র স্বভাবের ছিলেন।"

এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এ মৌলিক সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবীদের সেসব কাজই কেবল অনুসরণযোগ্য যার ওপরে তাঁরা শেষ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। এরপর থাকে তাদের সেসব আমল যা তাঁরা পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন অথবা যেগুলোর ওপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বহাল থাকতে দেননি অথবা আল্লাহর শরীয়াতে যেসব আমলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তা অনুসরণযোগ্য নয়। অমুক নবী এ কাজ করেছেন এ যুক্তি দেখিয়ে কেউ নবীদের এ ধরনের কাজকর্মের অনুসরণ করতে পারে না।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যা মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে পারে। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীমের (আ) যে কথাটিকে আল্লাহ তা'আলা অনুসরণযোগ্য হওয়া থেকে বাদ দিয়েছেন তার দু'টি অংশ আছে। একটি অংশ হলো, তিনি তাঁর বাপকে বলেছিলেন ঃ আমি আপনার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবো। দ্বিতীয় অংশটি হলো,

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۞

হে আমাদের রব, আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিও না।[৮] *হে আমাদের রব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। নিসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।*

এসব লোকের কর্মপদ্ধতিতে তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রত্যাশী লোকদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।[৯] *এ থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রশংসিত।*[১০]

আল্লাহর নিকট থেকে আপনাকে ক্ষমা নিয়েই দেব এ সাধ্য আমার নেই। এ দু'টি কথার মধ্যে প্রথম কথাটি অনুসরণযোগ্য না হওয়া বোধগম্য। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটির মধ্যে কি এমন মন্দ দিক আছে যে, সেটিকে অনুসরণযোগ্য হওয়া থেকে বাদ দেয়া হয়েছে? অথচ তা নিতান্তই একটি সত্য কথা। এর জবাব হলো, হযরত ইবরাহীমের (আ) একথাটি বাদ পড়েছে এ জন্য যে, কেউ যখন কোন কাজ করে দেয়ার জন্য কারো সাথে ওয়াদা করার পর বলে যে, তোমার জন্য এর অধিক আর কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায়, যদি এর চেয়েও বেশী কিছু করার সাধ্য তার থাকতো তাহলে সে তার জন্য তাও করতো। একথাটি ঐ ব্যক্তির সাথে তার আরো গভীর সহানুভূতিমূলক সম্পর্কই প্রকাশ করে। এ কারণে হযরত ইবরাহীমের কথার দ্বিতীয় অংশটিও বাদ যাওয়ার উপযুক্ত। যদিও তার এ বিষয়বস্তু অতিব সত্য ও বাস্তব যে, আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমা বা মাগফিরাত নিয়ে দেয়া কোন নবীর ইখতিয়ার বহির্ভূত ব্যাপার। আল্লামা আলূসীও তাঁর তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মায়া'নীতে এ প্রশ্নের এ জবাব দিয়েছেন।

৮. কাফেরদের জন্য ঈমানদারদের ফিতনা হওয়ার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। ঈমানদার বান্দার উচিত এর সবগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। উদাহরণস্বরূপ, এর একটি অবস্থা হতে পারে কাফেররা মু'মিনদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। আর এই বিজয়কে তারা তাদের সত্যপন্থী হওয়ার এবং ঈমানদারদের বাতিলপন্থী হওয়ার প্রমাণ বলে ধরে নিতে পারে। তারা মনে করতে পারে, এ লোকগুলো যদি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ করে থাকে তাহলে কিভাবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করতে সক্ষম হলাম। দ্বিতীয় অবস্থা হতে পারে এই যে, ঈমানদারদের ওপর কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন সহ্যসীমা অতিক্রম করে যাওয়ার কারণে তারা পরিশেষে নতি স্বীকার করে বসবে এবং আদর্শ ও নৈতিকতার বিকিকিনি করে আপোষ করতে সম্মত হয়ে যাবে। এটা সারা দুনিয়ার সামনে ঈমানদারদের হাস্যাস্পদ হওয়ার কারণ হবে আর এভাবে কাফেররা দীন ও দীনের অনুসারীদের হেয় ও অপমানিত করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তৃতীয় আরেকটি

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ
وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ
يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ
وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨

২ রুকূ'

অসম্ভব নয় যে, আজ তোমরা যাদের শত্রু বানিয়ে নিয়েছো আল্লাহ তা'আলা তাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন এক সময় বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।[১১] *আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাবান। আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।*

যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন।[১২]

অবস্থা হতে পারে, দীনে হকের প্রতিনিধিত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও ঈমানদারগণ এই পদমর্যাদার উপযুক্ত নৈতিক গুণাবলী থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং তাদের জীবন, চরিত্র ও কর্মেও এমনসব দোষ-ত্রুটি থেকে যাবে যা জাহেলী সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান থাকে। এভাবে কাফেররা বলার সুযোগ পাবে যে, এ আদর্শের মধ্যে এমন কি সৌন্দর্যবৈশিষ্ট ও কল্যাণকর বিষয় আছে যা তাকে আমাদের কুফরী আদর্শের তুলনায় অধিক মর্যাদা দান করে? (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, টীকা, ৮৩)।

৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, একদিন তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং এ আশাও করে যে, আল্লাহ যেন তাকে তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামত দানে ধন্য করেন আর আখেরাতের দিন সে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়।

১০. অর্থাৎ এমন ঈমানদারদের দিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই যারা তাঁর দীনকে মানার দাবীও করবে আবার তাঁর দুশমনের সাথে বন্ধুত্বও করবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। এসব লোক তাঁকে আল্লাহ হিসেবে মানুক আল্লাহর উলুহিয়াত এর মুখাপেক্ষী নয়। তিনি তাঁর সত্তায় নিজেই প্রশংসিত। তাঁর প্রশংসিত হওয়া এদের প্রশংসা করার ওপর নির্ভর করে না। এরা যদি ঈমান গ্রহণ করে তাতে আল্লাহর কোন উপকার হবে না। বরং তাতে তাদের নিজেদেরই উপকার হবে। আর যে পর্যন্ত না তারা হযরত ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মত আল্লাহর দুশমনদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না করবে সে পর্যন্ত তারা নিজেদের ঈমান দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

إِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করছেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে, বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই জালেম।[১৩]

১১. পূর্বোল্লেখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়–স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল প্রকৃত ঈমানদারগণ অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে যদিও তা মেনে চলছিলেন, কিন্তু নিজের মা, বাপ, ভাই, বোন এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কত কঠিন কাজ এবং এ কাজ ঈমানদারদের মন মানসিকতার জন্য কতটা দুর্বিসহ তা আল্লাহ ভাল করেই জানতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই বলে সান্তনা দিয়েছেন যে, সেই সময় বেশী দূরে নয়, যখন তোমাদের এসব আত্মীয়–স্বজন ইসলাম গ্রহণ করবে এবং বর্তমান সময়ের এই শত্রুতা ভবিষ্যতে আবার ভালবাসায় রূপান্তরিত হবে। যে সময় একথা বলা হয়েছিল সে সময় কারো পক্ষেই বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না তা কিভাবে হবে। কিন্তু এসব আয়াত নাযিলের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই মক্কা বিজিত হলো, এ সময় কুরাইশরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকল এবং মুসলমানগণ দিব্যি দেখতে পেল, যে বিষয়ের আশাবাদ তাদের শুনান হয়েছিল তা কিভাবে বাস্তব রূপ লাভ করল।

১২. এখানে কারো মনে এরূপ সংশয় দেখা দিতে পারে যে, যেসব কাফের শত্রুতা করছে না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারটি তো যুক্তিসংগত। কিন্তু ইনসাফও কি শুধু তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। কাফেরদের মধ্যে যারা শত্রু তাদের সাথে কি বেইনসাফী করতে হবে? এর জবাব হলো, পূর্বাপর এই প্রসংগের মধ্যে ইনসাফ কথাটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে ইনসাফ কথাটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করে না ইনসাফের দাবী হলো তোমরাও তার সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করবে না। শত্রু এবং অশত্রুকে একই মর্যাদা দেয়া এবং উভয়ের সাথে একই আচরণ করা ইনসাফ নয়। ঈমান আনার কারণে যারা তোমাদের ওপরে জুলুম–নির্যাতন চালিয়েছে। স্বদেশ ও জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছে এবং বের করে দেয়ার পরও তোমাদের পেছনে লেগে থাকতে ছাড়েনি তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু যারা এসব জুলুম–অত্যাচারে কোনভাবে শরীক হয়নি তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃ সম্পর্কের কারণে তোমাদের ওপরে তাদের যেসব অধিকার বর্তায় তা পূরণ করতে কার্পণ্য করবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾

হে ঈমানদাররা, ঈমানদার নারীরা যখন হিজরাত করে তোমাদের কাছে আসবে তখন (তাদের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নাও। তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা অবশ্য আল্লাহই ভাল জানেন। অতপর যদি তোমরা বুঝতে পার যে, তারা সত্যিই ঈমানদার তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিও না।[১৪] না তারা কাফেরদের জন্য হালাল না কাফেররা তাদের জন্য হালাল। তাদের কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছে তা তাদের ফিরিয়ে দাও। তাদেরকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করায় তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।[১৫] আর তোমরা নিজেরাও কাফের নারীদেরকে নিজেদের বিয়ের বন্ধনে আটকে রেখো না। নিজেদের কাফের স্ত্রীদের তোমরা যে মোহরানা দিয়েছ তা ফেরত চেয়ে নাও। আর কাফেররা তাদের মুসলমান স্ত্রীদের যে মোহরানা দিয়েছে তাও যেন তারা ফেরত চেয়ে নেয়।[১৬] এটি আল্লাহর নির্দেশ। তিনি তোমাদের সবকিছুর ফায়সালা করেন। আল্লাহ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

১৩. পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সে বিষয়ে লোকের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, তাদের কাফের হওয়ার কারণেই বুঝি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতগুলোতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের কুফরী এর মূল কারণ নয়। বরং ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে তাদের শত্রুতা ও নির্যাতনমূলক আচরণই এর মূল কারণ। অতএব, মুসলমানদের উচিত শত্রু কাফের এবং অশত্রু কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য করা, আর যেসব কাফের কখনো তাদের কোন ক্ষতি করেনি তাদের সাথে ইহসান ও অনুগ্রহের আচরণ করা উচিত। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর এবং তাঁর মায়ের ঘটনাটি এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। হযরত আবু বকরের (রা) এক স্ত্রী কুতাইলা বিনতে আবদুল উয্‌যা কাফের ছিলেন এবং হিজরাতের পর মক্কায়

থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভেই হযরত আসমা জন্ম লাভ করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদীনা এবং মক্কার মধ্যে যাতায়াত শুরু হলে তিনি মেয়েকে দেখার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে মদীনায় হাজির হলেন। হযরত আসমার (রা) নিজের বর্ণনা হলো ঃ আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি কি আমার মায়ের সংগে দেখা করব? আর আমি কি তার সাথে আপনজনের মত সদাচরণও করব? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তার সাথে আপনজনদের মত সদাচরণ কর। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম) হযরত আসমার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এ ঘটনাটি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে বলছেন, প্রথমে হযরত আসমা মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পরে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সা) অনুমতি পাওয়ার পর তিনি তার সাথে দেখা করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম) এ থেকে স্বতঃই যে সিদ্ধান্তলাভ করা যায় তা হলো ইসলামের দুশমন না হলে কাফের পিতা মাতার খেদমত করা এবং কাফের ভাইবোন ও আত্মীয়–স্বজনকে সাহায্য করা একজন মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণরূপে জায়েয। একইভাবে গরীব ও অসহায় জিম্মিদের জন্য সাদকার অর্থও খরচ করা যেতে পারে। (আহকামুল কুরআন—জাসসাস, রূহুল মায়ানী)

১৪. এই নির্দেশের পটভূমি হলো, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রথম প্রথম মুসলমানরা মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় এসে হাজির হতে থাকল এবং সন্ধির শর্ত মোতাবেক তাদেরকে যথারীতি ফেরত পাঠান হতে থাকল। এরপর মুসলিম নারীদের আগমন শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা ইবনে আবু মু'আইত হিজরত করে মদীনায় এসে পৌঁছলেন। কাফেররা চুক্তির কথা বলে তাকেও ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানাল। উম্মে কুলসূমের দুই ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবা এবং উমারা ইবনে উকবা তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মদীনায় হাজির হলো। তখন এ মর্মে প্রশ্ন দেখা দিল যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি না? এখানে আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে বলেছেন ঃ যদি সে মুসলমান হয় এবং নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সে ঈমানের জন্যই হিজরাত করে এখানে এসেছে অন্য কিছু তাকে এখানে আনেনি, তাহলে তাকে ফেরত পাঠান যাবে না।

এ ক্ষেত্রে হাদীসের শুধু ভাবার্থ বর্ণনা করার কারণে বড় রকমের একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান হওয়া আবশ্যক। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী সম্পর্কে হাদীসসমূহে আমরা যেসব বর্ণনা দেখতে পাই তার অধিকাংশই ভাবার্থের বর্ণনা। আলোচ্য শর্ত সম্পর্কিত কোন বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا -

"তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি আমাদের কাছে চলে আসে তাকে আমরা ফেরত পাঠাব না। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেউ তোমাদের কাছে চলে গেলে তাকে তোমরা ফিরিয়ে দেবে।"

কোন বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

مَنْ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَصْحَابِهِ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِ –

"রসূলুল্লাহর (সা) কাছে তাঁর সাহাবীদের কেউ যদি তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তিনি তাকে ফেরত পাঠাবেন।"

আবার কোন বর্ণনাতে আছে ঃ

مَنْ اَتٰى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ –

"কুরাইশদের কোন ব্যক্তি যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যায় তাহলে তিনি তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাবেন।"

এ সব রেওয়ায়াতের বর্ণনার ধরন থেকে আপনা আপনি এ কথা প্রকাশ পায় যে, মূলত চুক্তিতে সন্ধির শর্ত যে ভাষায় লেখা হয়েছিল এসব বর্ণনায় তা হুবহু উদ্ধৃত হয়নি। বরং বর্ণনাকারীগণ তার বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আর বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত যেহেতু এই প্রকৃতির তাই মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসগণ বুঝে নিয়েছেন যে, চুক্তির মধ্যে সাধারণভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তরভুক্ত এবং চুক্তি অনুসারে নারীদের ফেরত পাঠানো কর্তব্য ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তারা আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ দেখতে পেলেন যে, ঈমানদার নারীদের ফেরত পাঠান যেন না হয়, তখন তাঁরা এর ব্যাখ্যা করলেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নারীদের ক্ষেত্রে অন্তত চুক্তি ভঙ্গের ফায়সালা ও নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এটা সহজভাবে গ্রহণ করার মত কোন মামুলী বক্তব্য নয়। সন্ধি যদি প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সবার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে তাহলে একপক্ষ এক তরফাভাবে তাতে সংশোধনী যোগ করবে কিংবা নিজেদের পক্ষ থেকে তার কোন অংশ পরিবর্তন করে ফেলবে তা কি করে বৈধ হতে পারে? আর এরূপ করা হয়েছিল বলে যদি ধরেও নেয়া হয় তাহলে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, কুরাইশরা এর কোন প্রতিবাদই করল না। কুরাইশরা তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের প্রতিটি কথার সমালোচনা করার জন্য সর্বদা এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি সন্ধির শর্তাবলী স্পষ্ট লংঘন করেছেন এমন প্রমাণ পেশ করার সুযোগ পেলে তো তারা চিৎকার করে আসমান মাথায় তুলে নিত। কিন্তু কোন বর্ণনা থেকেই আমরা এ বিষয়ে আভাস পর্যন্ত পাই না যে, কুরআনের এই ফায়সালার বিরুদ্ধে তারা সামান্যতম আপত্তি বা প্রতিবাদ করেছে। এটি ছিল এমন একটি প্রশ্ন, যে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা করা হলেও চুক্তির মূল ভাষা অনুসন্ধান করে এই জটিলতার সমাধান পেশ করার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু অনেকে এদিকে লক্ষই করেননি। কেউ কেউ (যেমন কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী) লক্ষ করলেও তাঁরা কুরাইশদের আপত্তি ও প্রতিবাদ না করার কারণ হিসেবে এরূপ ব্যাখা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা মু'জিযার মাধ্যমে এ ব্যাপারে কুরাইশদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করে তাঁরা কিভাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

আসল কথা হলো, সন্ধি চুক্তির এই শর্তটি মুসলমানদের পক্ষ থেকে নয়, কুরাইশদের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছিল। তাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর চুক্তিপত্রে যে ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিল তা ছিল ঃ

عَلٰى اَنْ لَا يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَّاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهٗ اِلَيْنَا –

"আমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কোন পুরুষও যদি আসে আর সে যদি তোমাদের ধর্মের অনুসারীও হয় তাহলেও তোমরা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে।"

চুক্তির এই ভাষা বুখারী "কিতাবুশ্ শুরুতে বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ ওয়াল মুসালাহা" অনুচ্ছেদে মজবুত সনদে উদ্ধৃত হয়েছে। সুহাইল হয়তো 'রাজুল' (رجل) শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এটি তার চিন্তা ও মন–মস্তিষ্ক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। চুক্তিপত্রে রাজুল শব্দটিই লেখা হয়েছিল আরবী ভাষায় যা পুরুষদের বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই উম্মে কুলসুম বিনতে উকবার প্রত্যর্পণের দাবী নিয়ে তার ভাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে (ইমাম যুহরীর বর্ণনা অনুসারে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বললেন ঃ كان الشرط فى الرجال دون النساء এ শর্ত শুধু পুরুষদের ব্যাপারে ছিল, মেয়েদের ব্যাপারে ছিল না। (আহকামুল কুরআন—ইবনে আরাবী, তাফসীরে কাবীর—ইমাম রাযী)। তখন পর্যন্ত খোদ কুরাইশরাও এই ভুল ধারণার মধ্যে ছিল যে, নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সব ধরনের মুহাজিরদের বেলায় এ চুক্তি প্রযোজ্য। কিন্তু নবী (সা) যখন চুক্তির এই ভাষার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তখন তারা হতবাক ও লা–জওয়াব হয়ে গেল এবং বাধ্য হয়েই তাদেরকে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হলো।

যে কোন স্ত্রীলোক মক্কা ছেড়ে মদীনায় আসুক না কেন এবং যে উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন চুক্তির এই শর্ত অনুসারে তাকে প্রত্যর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার মুসলমানদের ছিল। কিন্তু ইসলাম আগ্রহী ছিল কেবলমাত্র ঈমানদার নারীদের নিরাপত্তা দান করতে। পালিয়ে আসা সব রকম স্ত্রীলোকের জন্য মদীনাকে আশ্রয় কেন্দ্র বানান ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে আসবে এবং তাদের ঈমানদার হওয়ার কথা প্রকাশ করবে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হও যে, প্রকৃতই তারা ঈমান গ্রহণ করে এখানে চলে এসেছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর আর তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিও না। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য যে নিয়ম পদ্ধতি রচনা করা হয়েছিল তা হলো, যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে মদীনায় চলে আসত তাদেরকে এ মর্মে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো যে, তারা সত্যিই আল্লাহর একত্ব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে কি না এবং কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হিজরাত করেছে কি না? ব্যাপারটা এমন নয়তো যে, সে স্বামীর প্রতি বিরূপ ও বিরক্ত হয়ে রাগে বা অভিমানে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে? কিংবা আমাদের এখানকার কোন পুরুষের প্রতি তার ভালবাসা ও অনুরাগ তাকে নিয়ে এসেছে? কিংবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ তার এ কাজের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে? যেসব স্ত্রীলোকেরা এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারত শুধু তাদেরকেই থাকতে দেয়া হতো এবং অবশিষ্ট সবাইকে ফিরিয়ে দেয়া হতো। (ইবনে জারীর—ইবনে আব্বাসের বর্ণনার বরাত দিয়ে কাতাদা, মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ)।

এ আয়াতে সাক্ষদান আইনেরও একটা মূলনীতি ও সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে আর তা কার্যকরী করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কর্মপদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছিলেন তা থেকে এর আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছে। আয়াতটিতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, হিজরাতকারিণী যেসব স্ত্রীলোক নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে পেশ করবে তাদের ঈমানের বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে দেখ। দুই, তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তারা প্রকৃতই ঈমান গ্রহণ করেছে কি না তা জানার কোন উপায় বা মাধ্যম তোমাদের কাছে নেই। তিন, যাঁচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে যখন তোমরা জানতে পারবে যে তারা ঈমানদার, তাহলে তাদেরকে ফেরত পাঠাবে না। তাছাড়াও এই নির্দেশ অনুসারে ঐ সব স্ত্রীলোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য নবী (সা) যে পদ্ধতি ঠিক করেছিলেন তা ছিল এই যে, সেসব মহিলাদের শপথভিত্তিক বক্তব্য বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, তাদের হিজরাত করার পেছনে উদ্বুদ্ধকারী শক্তি ঈমান ছাড়া অন্য কিছুই না। এ থেকে প্রথমত যে নীতিটি জানা গেল তাহলো মামলাসমূহের ফায়সালা করার জন্য প্রকৃত ঘটনা কি তা জানা থাকা আদালতের জন্য জরুরী নয়। বরং সাক্ষের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই এ জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, যে কথাটি জানা গেল তা হলো, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তার শপথ ভিত্তিক বক্তব্যের ওপর বিশ্বাসস্থাপন করব। তৃতীয়ত, যে কথাটি জানা গেল, কোন ব্যক্তি তার আকীদা–বিশ্বাস ও ঈমান সম্পর্কে নিজে যে কথা বলছে আমরা তা গ্রহণ করব এবং সে যা বলছে তার আকীদা–বিশ্বাস সত্যিই তাই কি না তা খুঁজে বেড়াতে শুরু করব না। তবে তার বক্তব্যের বিপরীত কোন স্পষ্ট প্রমাণ যদি আমাদের সামনে প্রকাশ পায় তাহলে ভিন্ন কথা। আর চতুর্থ আরেকটি কথা হলো, কোন ব্যক্তির যেসব একান্ত ব্যক্তিগত কথা অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয় সেসব ব্যাপারে তার নিজের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে। যেমন ঃ তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে এবং মেয়েদের মাসিক ও পবিত্রতার ব্যাপারে তার নিজের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সে সত্য মিথ্যা যাই বলুক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। এ নীতি অনুসারে "ইলমে হাদীস" বা হাদীসশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও সেসব বর্ণনা গ্রহণ করা হবে যার বর্ণনাকারীগণের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে কোন প্রমাণ বা ইংগিত বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করা হবে।

১৫. এর অর্থ হলো, তাদের কাফের স্বামীদেরকে তাদের যে মোহরানা ফেরত দেয়া হবে সেটিই ঐ সব মেয়েদের মোহরানা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং এখন যে কোন মুসলমানই তাদের কাউকে বিয়ে করতে চাইবে সে তাকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করবে।

১৬. এসব আয়াতে চারটি বড় বড় নির্দেশের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের পারিবারিক এবং আন্তর্জাতিক এই উভয় আইনের সাথেই এ চারটি নির্দেশ সম্পর্কিত।

প্রথম নির্দেশটি হলো, যে স্ত্রীলোক মুসলমান হয়ে যায় সে তার কাফের স্বামীর জন্য হালাল থাকে না আর তার কাফের স্বামীও তার জন্য হালাল থাকে না।

দ্বিতীয় নির্দেশটি হলো, যে বিবাহিতা নারী মুসলমান হয়ে দারুল কুফর থেকে হিজরাত করে দারুল ইসলামে আসে তার বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইচ্ছা করলে যে কোন মুসলমানই মোহরানা দিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারে।

তৃতীয় নির্দেশটি হলো, কোন পুরুষ লোক মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তার স্ত্রী যদি কাফেরই থেকে যায় তাহলে ঐ স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা তার জন্য জায়েয নয়।

চতুর্থ নির্দেশটি হলো, দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মধ্যে যদি সন্ধি চুক্তি বর্তমান থাকে তাহলে কাফেরদের যেসব বিবাহিত স্ত্রী হিজরাত করে দারুল ইসলামে চলে এসেছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেয়া এবং মুসলমানদের সাথে বিবাহিত যেসব কাফের স্ত্রী দারুল কুফরে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে প্রদত্ত মোহরানা কাফেরদের পক্ষ থেকে ফিরে পাওয়ার জন্য ইসলামী সরকারকে দারুল কুফরের সরকারের সাথে বিষয়টির ফায়সালা করার চেষ্টা করতে হবে।

এসব নির্দেশের ঐতিহাসিক পটভূমি হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন অনেক পুরুষ ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের স্ত্রীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। আবার এমন অনেক স্ত্রীলোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের স্বামীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক মেয়ে হযরত যয়নবের (রা) স্বামী আবুল আস ছিলেন অমুসলিম এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অমুসলিমই রয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান নারীদের জন্য তাদের কাফের স্বামী এবং মুসলমান স্বামীদের জন্য তাদের মুশরিক স্ত্রী হালাল নয় এমন কোন নির্দেশও ইসলামের প্রাথমিক যুগে হয়নি। তাই তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। হিজরাতের পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ সময় বহু সংখ্যক নারী মুসলমান হওয়ার পর হিজরাত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্বামীরা দারুল কুফরেই থেকে গিয়েছিল। আবার বহু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ হিজরাত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্ত্রীরা দারুল কুফরেই রয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের বিবাহ বন্ধন অবশিষ্ট ছিল। এতে বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছিল। কারণ, পুরুষরা তো দ্বিতীয় বিয়েও করতে পারে। কিন্তু মহিলাদের জন্য তা সম্ভব ছিল না। পূর্ব স্বামীর সাথে তার বিয়ে বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এসব আয়াত নাযিল হলে মুসলমান এবং কাফের ও মুশরিকদের মধ্যকার পূর্বের দাম্পত্য সম্পর্ক বাতিল করে দেয়া হয় এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা অকাট্য ও সুস্পষ্ট আইন তৈরী করে দেয়া হয়। ফিকাহবিদগণ এ আইনটিকে চারটি বড় বড় অনুচ্ছেদে সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন।

একটি অবস্থা হলো, স্বামী–স্ত্রী উভয়েই যদি দারুল ইসলামে অবস্থানকারী হয় এবং তাদের মধ্যে একজন মুসলমান হয়ে যায় আর অপরজন কাফেরই থেকে যায়।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, স্বামী–স্ত্রী উভয়েই যদি দারুল কুফরে অবস্থানকারী হয় এবং তাদের একজন মুসলমান হয়ে যায় কিন্তু অপরজন কাফেরই থেকে যায়।

তৃতীয় অবস্থা হলো, স্বামী–স্ত্রীর কোন একজন যদি মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে হিজরাত করে আসে এবং অপরজন দারুল কুফরে কাফের হিসেবেই থেকে যায়।

চতুর্থ অবস্থা হলো, মুসলমান স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন যদি মুরতাদ হয়ে যায়।

এই চারটি অবস্থা সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের কার কি মত আমরা তা আলাদা আলাদাভাবে নীচে বর্ণনা করছি।

এক ঃ প্রথম ক্ষেত্রে স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী খৃষ্টান কিংবা ইহুদী হয় এবং সে তার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে উভয়ের বিবাহ বন্ধন বহাল থাকবে। কারণ মুসলমান পুরুষের জন্য আহলে কিতাব স্ত্রী গ্রহণ করা বা থাকা জায়েয। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত।

আর ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষের স্ত্রী যদি আহলে কিতাব না হয় এবং সে তার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে সে সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য হলো ঃ স্ত্রীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিয়ে বহাল থাকবে। আর যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহরানা লাভের অধিকারীনী হবে এবং নির্জনবাস না হয়ে থাকলে মোহরানা লাভের কোন অধিকার তার থাকবে না। কারণ তার অস্বীকৃতির কারণেই বিচ্ছেদ ঘটেছে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ বলেন ঃ স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে তিনবার মাসিক আসা পর্যন্ত স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধনে থাকবে। এ সময়ের মধ্যে সে যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিয়ে বহাল থাকবে। অন্যথায়, তৃতীয় বার মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথেই আপনা থেকেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র) একথাও বলেন যে, আমাদের পক্ষ থেকে যিম্মীদেরকে তাদের ধর্মীয় কাজে হস্তক্ষেপ না করার যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে নারীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করাও ঠিক হবে না। কিন্তু বাস্তবে এটা একটা দুর্বল যুক্তি। কারণ একজন যিম্মী নারীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলে তখনই কেবল তা তার ধর্ম মতে বাধা সৃষ্টি করা বলে গণ্য হবে। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে তোমার স্বামীর সাথে থাকতে পারবে অন্যথায় তোমাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে, শুধু এই কথাটি তাকে বলা তার ধর্মমতে কোন প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ নয়। হযরত আলীর (রা) খিলাফত কালে এ ধরনের একটি ঘটনার নজীর পাওয়া যায়। তখন ইরাকের একজন অগ্নিপূজক জমিদার ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তার স্ত্রী কাফেরই থেকে যায়। হযরত আলী (রা) তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিলেন। (আল মাবসূত) ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তার কাফের স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে নারীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। (আল মুগনী ইবনে কুদামা)।

পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী কাফের থেকে যায় তাহলে সে আহলে কিতাব হোক বা না হোক এবং উভয়ের নির্জনবাস হয়ে থাক বা না থাক হানাফীদের মতে সর্বাবস্থায় স্বামীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করলে নারী তার বিবাহ বন্ধনে বহাল থাকবে এবং অস্বীকৃতি জানালে কাজী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পর স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত

ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি না জানাবে ততক্ষণ পর্যন্ত নারী তার স্ত্রী থাকবে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভের অধিকার তার থাকবে না। স্বামীর অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটবে তা হবে বায়েন তালাক হিসেবে। এমতাবস্থায় নির্জনবাস না হয়ে থাকলে নারী নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী হবে। আর নির্জনবাস হয়ে থাকলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দতকালীন খোরপোষ লাভেরও অধিকারী হবে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, নির্জনবাস না হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং নির্জনবাস হওয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহ বন্ধনে বহাল থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিবাহ বহাল থাকবে। অন্যথায় ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু নারীর বেলায় ইমাম শাফেয়ীর (র) যে মত ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে পুরুষের বেলায়ও তিনি সেই একই মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা জায়েয নয়। তবে এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে এ ধরনের বেশ কিছু সংখক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পুরুষকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে আর যখন সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তখন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হলো। যেমন ঃ বনী তাগলেব গোত্রের জনৈকা খৃষ্টান স্ত্রীলোকের ব্যাপারটি তার সামনে পেশ করা হলে তিনি স্বামীকে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। তা নাহলে আমি তোমাদের দু'জনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেব। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তিনি তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি দিয়ে দিলেন। বাহযুল মালিকের এক নওমুসলিম জমিদারনীর মামলা তাঁর কাছে পাঠান হলে এ মামলাতেও তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তার স্বামীর সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হোক। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ভাল কথা। অন্যথায় দু'জনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান হোক। সাহাবায়ে কিরামের সামনেই এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন বলে উল্লেখ নেই। (আহকামুল কুরআন জাস্সাস, আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর) এ ব্যাপারে ইমাম মালেকের (র) রায় হলো, স্ত্রী যদি নির্জনবাসের পূর্বেই মুসলমান হয়ে যায় তাহলে স্বামীর সামনে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করতে হবে। সে যদি দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে উত্তম। অন্যথায় অবিলম্বে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কিন্তু যদি নির্জনবাস হওয়ার পরে স্ত্রীলোকটি ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে ইদ্দতের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে। অন্যথায় ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদের (র) একটি মত ইমাম শাফেয়ীর (র) মতকে সমর্থন করে। তাঁর দ্বিতীয় মতটি হলো, নির্জনবাস হোক বা না হোক স্বামী এবং স্ত্রীর দীন বা ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় তাৎক্ষণিক বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ বলে গণ্য হবে। (আল মুগনী)

দুই ঃ স্ত্রী যদি দারুল কুফরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী কাফের থেকে যায় অথবা স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্ত্রী (যে খৃষ্টান বা ইহুদী বরং আহলে কিতাব নয় এমন ধর্মের অনুসারী হয়) তার ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকে এমতাবস্থায় হানাফীদের মতে তাদের নির্জনবাস হোক বা না হোক স্ত্রীর তিনবার মাসিক না হওয়া কিংবা মাসিক রহিতা হয়ে

থাকলে তিন মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটবে না। এ সময়ের মধ্যে অপরজনও মুসলমান হয়ে গেলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে। অন্যথায় এ সময় শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও ইমাম শাফেয়ী (র) নির্জনবাস হওয়া এবং না হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন। তাঁর রায় হলো, নির্জনবাস যদি না হয়ে থাকে তাহলে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। আর যদি নির্জনবাস হওয়ার পরে ধর্মের ভিন্নতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে ইদ্দতের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে বহাল থাকবে। এ সময়ের মধ্যে যদি অপরজন ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিয়েও বাতিল হয়ে যাবে। (আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস)

তিন ঃ যে ক্ষেত্রে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা হওয়ার সাথে সাথে দেশও ভিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের কোন একজন কাফের অবস্থায় দারুল কুফরে থেকে যায় এবং অপরজন হিজরাত করে দারুল ইসলামে চলে আসে তাদের সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য হলো তাদের বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যাবে। হিজরাত করে অগমনকারী যদি নারী হয় তাহলে তার তখনই দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকে। তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। তবে স্ত্রীর সাহচর্য লাভ করতে হলে তার গর্ভে সন্তান আছে কিনা তা জানার জন্য একবার মাসিক আসা পর্যন্ত স্বামীকে অপেক্ষা করতে হবে। আর সে যদি গর্ভবতীও হয় তবুও বিয়ে হতে পারবে। তবে একান্ত নৈকট্য লাভের জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ মাসয়ালায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবু হানীফার সাথে শুধু এতটুকু ভিন্ন মত পোষণ করেছেন যে, নারীকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হতে পারবে না। (আল মাবসূত, হিদায়া, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস) ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আহমাদ (র) এবং ইমাম মালেক বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে দেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কিছুই এসে যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে মূল জিনিস হলো ধর্মের ভিন্নতা। যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের এই ভিন্নতা সৃষ্টি হয় তাহলে দারুল ইসলামে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিধান প্রযোজ্য এ ক্ষেত্রেও সেই একই বিধান প্রযোজ্য হবে। (আল মুগনী)।

হিজরাতকারিনী মুসলমান নারী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র) তার পূর্বোল্লেখিত মতের সাথে সাথে এ মতও প্রকাশ করেন যে, সে যদি তার কাফের স্বামীর সাথে ঝগড়া–বিবাদ করে তার স্বামীত্বের অধিকার রহিত করার উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে দেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে নয় বরং তার এই সংকল্প ও ইচ্ছার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহ–বিচ্ছেদ ঘটবে । (আল মাবসূত, হিদায়া)।

কিন্তু কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার মতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি হিজরাত করে আগমনকারী ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে নাযিল করেছিলেন এবং তাদের ব্যাপারেই বলেছেন যে, তারা তাদের দারুল কুফরে ছেড়ে আসা কাফের স্বামীদের জন্য এখন আর হালাল নয়। আর মোহরানা দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করার জন্য দারুল ইসলামের মুসলমানদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অপর দিকে মুহাজির মুসলমানদের

সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যেসব কাফের স্ত্রী দারুল কুফরে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখ না। ঐ সব স্ত্রীদেরকে তোমরা যে মোহরানা দিয়েছ কাফেরদের থেকে তা চেয়ে নাও। এটা স্পষ্ট যে, শুধু দীন বা ধর্মের ভিন্নতার কারণে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং যে অবস্থা ও পরিবেশ এসব হুকুমকে বিশেষ রূপ দান করেছে তাহলো দেশের ভিন্নতা। হিজরাতের কারণে কাফের স্বামীদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না হয়ে থাকলে তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি মুসলমানদের কি করে দেয়া যেতে পারে। তাও আবার এমনভাবে যে, এ অনুমতির ক্ষেত্রে ইদ্দত পালনের কোন ইংগিত পর্যন্ত নেই। অনুরূপ لا تمسكوا بعصم الكوافر এর নির্দেশ আসার পরও যদি মুসলমান মুহাজিরদের কাফের স্ত্রীরা তাদের বিবাহ বন্ধনের মধ্যেই থাকত তাহলে সংগে সংগে এ হুকুমও দেয়া হতো যে, তাদের তালাক দিয়ে দাও। কিন্তু এখানে সেদিকেও কোন ইংগিত দেয়া হয়নি। একথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা), হযরত তালহা এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাজির তাঁদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এরূপ করা তাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া না হওয়া তালাক দেয়ার ওপরেই নির্ভর করছিল। আর তারা তালাক না দিলে ঐসব স্ত্রী তাদের স্ত্রীই থেকে যেত।

এর জবাবে নবীর (সা) যুগের তিনটি ঘটনাকে নজীর হিসেবে পেশ করা হয়। এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেশের ভিন্নতার কারণে মু'মিন ও কাফের স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন যে ঠিক রেখেছেন এসব ঘটনাকে তার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। প্রথম ঘটনাটি হলো, মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে আবু সুফিয়ান মাররুয্ যাহরান (বর্তমান ওয়াদীয়ে ফাতেমা) নামক স্থানে মুসলিম সেনাদলের কাছে এসে সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তাঁর স্ত্রী হিন্দ কাফের হিসেবে মক্কায়ই থেকে যায়। মক্কা বিজয়ের পর হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করে। আর বিয়ে নবায়ন না করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পূর্বের বিয়ে বহাল রাখেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমা ইবনে আবু জাহল এবং হাকীম ইবনে হিযাম মক্কা থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁদের উভয়ের স্ত্রী তাঁদের চলে যাওয়ার পর মুসলমান হয়ে যান। এরপর তারা নবীর (সা) নিকট থেকে তাদের স্বামীর জন্য নিরাপত্তা নেন এবং গিয়ে তাদের নিয়ে আসেন। উভয়েই ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরও পূর্ব বিয়ে বহাল রাখলেন। তৃতীয় ঘটনাটি নবীর (সা) নিজের মেয়ে হযরত যয়নাবের (রা)। হযরত যয়নাব (রা) হিজরাত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী আবুল আস কাফের হিসেবে মক্কায়ই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত হলো, তিনি ৮ম হিজরীতে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (সা) তাঁদের বিয়েও নবায়ন করেননি বরং পূর্বের বিয়ের ভিত্তিতে নিজের মেয়েকে আবুল আসের স্ত্রী হিসেবে থাকতে দিয়েছেন। এসব ঘটনার মধ্যে প্রথম দু'টি ঘটনা প্রকৃতপক্ষে দেশ ভিন্ন হওয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ সাময়িকভাবে এক ব্যক্তির একদেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া দেশের ভিন্নতা নয়। কেবল সেই ক্ষেত্রেই দেশের ভিন্নতা হয় যখন কোন ব্যক্তি একদেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে

বর্তমান কালের পরিভাষা অনুসারে জাতীয়তার (Nationality) পার্থক্য দেখা দেয়। এরপর থাকে কেবল সাইয়েদা যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারটি। এ ব্যাপারে দু'টি রেওয়ায়াত আছে। একটি হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত। ওপরে যার বরাত দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আসের রেওয়ায়াত। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজা এটি উদ্ধৃত করেছেন। দ্বিতীয় এই রেওয়ায়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় মোহরানা নির্ধারণ করে নতুনভাবে মেয়েকে আবুল আসের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। যারা স্বামী ও স্ত্রীর দেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার আইনগত প্রভাব অস্বীকার করেন রেওয়ায়াতের এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই নজীরটি তাদের জন্য প্রথমত অকাট্য দলীল হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তারা যদি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতকেই বিশুদ্ধ বলে গুরুত্ব দেন তাহলে তা তাদের নিজেদেরই মতের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ তাদের মতানুসারে যেসব স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে যদি তাদের নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর তিনবার মাসিক হওয়া পর্যন্ত তাদের বিয়ে অক্ষুণ্ন থাকে। এই সময়ের মধ্যে অপরজনও ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকে। অন্যথায় তৃতীয় মাসিক আসলে বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু হযরত যয়নাবের যে ঘটনাকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন তাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার পর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। হযরত যয়নাবের হিজরাতের ছয় বছর পর আবুল আস ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং কুরআনের যে নির্দেশ অনুসারে মুসলমান নারীদেরকে মুশরিকদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল তা তাঁর ঈমান গ্রহণের অন্তত দুই বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

চার ঃ চতুর্থ বিষয়টি মুরতাদ হওয়া সম্পর্কিত। এর একটি অবস্থা হলো স্বামী–স্ত্রী উভয়েরই মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় অবস্থা হলো তাদের কোন একজনের মুরতাদ হয়ে যাওয়া আর অপরজনের মুসলমান থাকা।

স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে যদি একই সাথে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে শাফেয়ী এবং হাম্বলী উলামাদের মতে নির্জনবাসের পূর্বে এরূপ হলে তৎক্ষণাৎ আর নির্জনবাসের পরে হলে ইদ্দতের সময় শেষ হওয়া মাত্র মুসলিম থাকা অবস্থায় যে বিয়ে হয়েছিল তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে, যদিও তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়াই সাধারণ বিবেক–বুদ্ধি ও যুক্তির দাবী কিন্তু হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে মুরতাদ হওয়ার যে ব্যাপক ফিতনা দেখা দিয়েছিল তাতে হাজার হাজার মানুষ মুরতাদ হওয়ার পর আবার মুসলমান হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম তাদের কাউকেই বিয়ে নবায়নের জন্য নির্দেশ দেননি। তাই আমরা সাহাবীদের ঐকমত্য ভিত্তিক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধির বিপক্ষে একথা মেনে নিচ্ছি যে, স্বামী–স্ত্রীর এক সাথে মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)

স্বামী যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং স্ত্রী মুসলমান থাকে এমতাবস্থায় ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাক বা না থাক হানাফী ও মালেকীদের মতে তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু শাফেয়ী এবং হাম্বলীগণ এ ক্ষেত্রে নির্জনবাসের পূর্বের ও পরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাদের মতে, নির্জনবাসের পূর্বে যদি এরূপ হয়ে

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪

তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেয়া মোহরানার কিছু অংশ যদি তোমরা ফেরত না পাও এবং পরে যদি তোমরা সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে যাদের স্ত্রীরা ওদিকে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে তাদের দেয়া মোহরানার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও।[১৭] যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো তাকে ভয় করে চলো।

থাকে তাহলে বিবাহ বন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যদি নির্জনবাসের পরে হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ বন্ধন ইদ্দতের সময়–কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে। সে যদি এ সময়ের মধ্যে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে বিবাহ ঠিক থাকবে। অন্যথায় ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে বিয়ে বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে। অর্থাৎ স্ত্রীকে নতুন করে আর কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। চারটি মযহাবের ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, নির্জনবাসের পূর্বে এ ঘটনা ঘটে থাকলে স্ত্রী অর্ধেক মোহরানা এবং নির্জনবাসের পরে ঘটে থাকলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভের অধিকারী হবে।

আর স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে হানাফীদের পুরনো ফতোয়া হলো, বিয়ে তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে বলখ ও সমরখন্দের আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, স্ত্রী মুরতাদ হওয়ার সংগে সংগেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। স্বামীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য স্ত্রীরা যাতে মুরতাদ হওয়ার পথ অনুসরণ না করে সেজন্যই তারা এ পন্থার সাহায্য নিয়েছেন। মালেকীদের ফতোয়াও অনেকটা এরূপ। তাঁরা বলেন ঃ যদি এমন ইংগিত পাওয়া যায় যে, স্ত্রী কেবলমাত্র স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পন্থা হিসেবে মুরতাদ হয়েছে তাহলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে না। শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহাবের মতে স্বামীর মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে যে আইন প্রযোজ্য স্ত্রীর মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রেও সেই একই আইন প্রযোজ্য। অর্থাৎ নির্জনবাসের পূর্বে মুরতাদ হলে বিয়ে তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে। আর নির্জনবাসের পরে মুরতাদ হলে ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে ঠিক থাকবে। এ সময়ের মধ্যে সে মুসলমান হয়ে গেলে দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকবে। তা নাহলে ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। মোহরানার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্ত্রী যদি নির্জনবাসের পূর্বে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে মোহরানা আদৌ পাবে না। তবে সে যদি নির্জনবাসের পরে মুরতাদ হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভ করবে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আল মুগনী, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

১৭. এ ব্যাপারে দু'টি অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ দু'টি ক্ষেত্রেই এ আয়াতটি প্রযোজ্য ঃ একটি অবস্থা ছিল এই যে, যেসব কাফেরের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল মুসলমানরা তাদের সাথে বিষয়টির ফায়সালা করতে চাচ্ছিল এভাবে যে, যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে আমাদের কাছে চলে এসেছে আমরা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেব। আর আমাদের লোকদের যেসব কাফের স্ত্রী ওদিকে রয়ে গিয়েছে তোমরা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দাও। কিন্তু তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করল না। ইমাম যুহরী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ অনুসারে আমল করার জন্য মুসলমানগণ সেই স্ত্রীদের মোহরানা ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল যারা মক্কায় কাফেরদের কাছে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিল মুশরিকরা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানাল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন ঃ মুশরিকদেরকে মুহাজির মহিলাদের যে মোহরানা ফিরিয়ে দিতে হবে তা তাদের ফিরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে মদীনাতেই জমা করা হোক এবং মুশরিকদের কাছে যেসব লোকের মোহরানা পাওনা আছে জমাকৃত এই অর্থ থেকে তাদের প্রত্যেককে কাফেরদের কাছে পাওনা অর্থের সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেয়া হোক।

দ্বিতীয় অবস্থাটি ছিল এই যে, যেসব কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল না তাদের এলাকা থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে এসেছিল এবং তাদের কাফের স্ত্রীরা সেখানেই রয়ে গিয়েছিল। একই ভাবে কিছু কিছু মহিলাও মুসলমান হয়ে হিজরাত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্বামীরা সেখানেই রয়ে গিয়েছিল। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হলো যে, দারুল ইসলামেই অদল–বদল করে বিষয়টি চুকিয়ে দেয়া হোক। কাফেরদের নিকট থেকে যখন কোন মোহরানা ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না তখন তাদেরকেও কোন মোহরানা ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। তার পরিবর্তে যেসব স্ত্রীলোক দারুল ইসলামে চলে এসেছে তাদের ফেরতযোগ্য মোহরানা সেই স্বামীদের দেয়া হোক যাদের স্ত্রীরা কাফেরদের সাথে তাদের এলাকায় রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এভাবে যদি হিসেব সমান সমান না হয় এবং যেসব মুসলমানের স্ত্রীরা কাফেরদের সাথে রয়ে গিয়েছে তাদের পাওনা মোহরানা হিজরাত করে আসা মুসলমান মহিলাদের মোহরানার পরিমাণ থেকে বেশী হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় যে গনীমাতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হবে তা দ্বারা অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করতে হবে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির অংশের মোহরানা পাওনা থেকে যেত নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম গনীমাতের মাল থেকে তার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিতেন। (ইবনে জারীর) আতা, মুজাহিদ, যুহরী, মাস্রূক, ইবরাহীম নাখায়ী, কাতাদা, মুকাতিল এবং দাহ্হাক এ নীতি গ্রহণ করেছেন । তাঁরা বলেন, যে লোকদের প্রাপ্য মোহরানা কাফেরদের কাছে রয়ে গিয়েছে কাফেরদের নিকট থেকে হস্তগত হওয়া গনীমাতের মালের মোটের ওপর থেকে তার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ গনীমাত বন্টনের পূর্বে তাদের হাতছাড়া হওয়া মোহরানা তাদের দিয়ে দিতে হবে এবং তারপর গনীমাত বন্টিত হবে। আর তখন এসব লোকও অন্য সব মুজাহিদদের মত সমান অংশ লাভ করবে। কোন কোন ফকীহ একথাও বলেন যে, শুধু

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ
شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ
بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ
مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

হে নবী, ঈমানদার নারীগণ যখন তোমার কাছে বাইয়াত গ্রহণের জন্য আসে[১৮] এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না,[১৯] যিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না[২০] সন্তান সম্পর্কে কোন অপবাদ তৈরী করে আনবে না[২১] এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্য হবে না[২২] তাহলে তাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করো[২৩] এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

গনীমাতের সম্পদ থেকেই নয়, বরং 'ফাই' এর অর্থ দ্বারাও এসব লোকের ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু আলেমদের একটি বড় দল এই মতটি গ্রহণ করেননি।

১৮. আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মক্কা বিজিত হলে কুরাইশরা বাইয়াতের জন্য দলে দলে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে হাজির হতে থাকল। তিনি নিজে সাফা পাহাড়ের ওপর পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মহিলাদের 'বাইয়াত' গ্রহণ করতে এবং এ আয়াতে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিতে হযরত উমরকে (রা) নির্দেশ দিলেন। (ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে ইবনে জারীর, কাতাদার বর্ণনা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম) এরপর তিনি মদীনায় ফিরে গিয়ে আনসারী মহিলাদের এক জায়গায় জমায়েত করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য হযরত উমরকে (রা) পাঠালেন। (ইবনে জারীর, ইবনে মারদইয়া, বায্যার, ইবনে হিব্বান উম্মে আতিয়া আনসারিয়ার বর্ণনা সূত্রে) তিনি ঈদের দিনেও পুরুষদের সমাবেশে বক্তৃতা করার পর মহিলাদের সমাবেশে গিয়েছেন এবং সেখানেও বক্তৃতার মধ্যে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এর মধ্যে যেসব বিষয়ের উল্লেখ আছে সেসব বিষয়ে তিনি মহিলাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। (বুখারী ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে) এসব ক্ষেত্র ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মহিলারা ব্যক্তিগতভাবেও এবং সমষ্টিগতভাবেও তাঁর কাছে হাজির হয়ে বাইয়াত গ্রহণ করত যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৯. মক্কায় যে সময় মহিলাদের নিকট থেকে বাইয়াত নেয়া হচ্ছিল সেই সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা এই নির্দেশটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আবু সুফিয়ান কিছুটা

কৃপণ প্রকৃতির লোক। আমি যদি তাকে না জানিয়ে আমার এবং আমার সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সম্পদ থেকে কিছু নেই তাতে কি আমার কোন গোনাহ হবে? তিনি বললেন ঃ না, তবে ন্যায়সংগত সীমার মধ্যে থেকে। অর্থাৎ ঠিক এতটা অর্থ নাও যা প্রকৃত অর্থে বৈধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট । (আহকামুল কুরআন, ইবনে আরাবী)।

২০. গর্ভপাত ঘটানোও এর অন্তরভুক্ত তা বৈধ গর্ভ বা অবৈধ গর্ভ যাই হোক না কেন।

২১. এর দ্বারা দুই প্রকারের অপবাদ বুঝানো হয়েছে। এক, কোন নারীর অন্য কোন নারীর প্রতি পরপুরুষের সাথে প্রেম-প্রণয় করার অপবাদ আরোপ করা এবং এ ধরনের কল্পকাহিনী মানুষের মধ্যে ছড়ান। কারণ এসব কথা বলে বেড়ানোর একটা রোগ মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। দুই, কোন নারীর অন্য পুরুষের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করে স্বামীকে বিশ্বাস করানো যে, সেটা তারই সন্তান—এটাও অপবাদের অন্তরভুক্ত। আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবীকে (সা) বলতে শুনেছেন যে, যে নারী কোন পরিবারে এমন কোন সন্তান প্রবেশ করায় যে সেই বংশের সন্তান নয়, সেই নারীর আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

২২. সংক্ষিপ্ত এই আয়াতাংশে আইনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করা হয়েছেঃ

প্রথম বিষয়টি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারেও "ভাল কাজে আনুগত্য করা" কথাটি যোগ করা হয়েছে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ ছিল না যে, তিনি কখনো মুনকার বা মন্দ কাজের নির্দেশও দিতে পারেন। এভাবে আপনা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর আইন ও নির্দেশের বাইরে গিয়ে পৃথিবীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা যেতে পারে না। কারণ আল্লাহর রসূলের আনুগত্যের ব্যাপারেও যখন মারূফ বা ভাল কাজ হওয়ার শর্তযুক্ত করা হয়েছে তখন শর্তহীন আনুগত্য লাভের মর্যাদা অন্য কারো কিভাবে থাকতে পারে। কিংবা তার এমন কোন নির্দেশ অথবা আইন অথবা নিয়ম-কানুন এবং আচার অনুষ্ঠানের আনুগত্য কিভাবে করা হবে যা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী? এই মৌলিক নীতিটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ ، اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

"আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা যেতে পারে না। মারূফ বা সুকৃতির কাজেই কেবল আনুগত্য করা যেতে পারে। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীগণ এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে এই বিষয়টিকেই গ্রহণ করেছেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ

"আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি যে, তারা যেন আদৌ তোমার নাফরমানী না করে, বরং বলেছেন যে, মারূফ বা ভাল কাজে তারা যেন তোমার নাফরমানী না করে। আল্লাহ তা'আলা যখন নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে পর্যন্ত এ শর্ত যুক্ত করেছেন তখন মারূফ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে অন্যদের আনুগত্য করা যাবে তা কি করে হতে পারে।" (ইবনে জারীর)

ইমাম আবু বকর জাস্সাস লিখছেন ঃ

আল্লাহ জানতেন, তাঁর নবী মারুফ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন না। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নবীর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে মারুফ বা ভাল কাজের শর্ত আরোপ করেছেন। যাতে আল্লাহর আনুগত্যমূলক নির্দেশ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ কখনো কোন রাজশক্তির আনুগত্যের অবকাশ খুঁজে বের করতে না পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اَطَاعَ مَخْلُوْقًا فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الْمَخلوق-

"যে ব্যক্তি স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর উক্ত সৃষ্টিকে কর্তৃত্ব দান করেন।" (আহকামুল কুরআন)

আল্লামা আলুসী বলেন ঃ

"যেসব মূর্খ মনে করে 'উলুল আমর' বা শাসন কর্তৃত্বের আনুগত্য শর্তহীন, এ নির্দেশ তাদের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তা'আলা তো রসূলের নির্দেশের আনুগত্য করার জন্যও ভাল কাজের নির্দেশ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। অথচ রসূল কখনো 'মারূফ' বা ভাল কাজের জন্য ছাড়া নির্দেশ দেন না। এর উদ্দেশ্য মানুষকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া যে, স্রষ্টার নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা জায়েয নয়।" (রূহুল মা'য়ানী)

এই নির্দেশটি প্রকৃতপক্ষে ইসলামে আইনের শাসনের (Rull of law) ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। মৌলিক কথা হলো, ইসলামের পরিপন্থী প্রত্যেকটি কাজই অপরাধ এবং কাউকে এ ধরনের কাজ করতে নির্দেশ দেয়ার আইনগত অধিকার কারো নেই। যে ব্যক্তিই আইনের পরিপন্থী কোন কাজের নির্দেশ দেয় সে নিজেই একজন অপরাধী। আর যে ব্যক্তি সে নির্দেশ পালন করে সে–ও অপরাধী। অধীনস্ত কোন ব্যক্তিই এ যুক্তি দেখিয়ে শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না যে, তার উর্ধতন কর্মকর্তা তাকে এমন একটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিল যা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আইনগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলো এ আয়াতটিতে পাঁচটি নেতিবাচক নির্দেশ দেয়ার পর একটি মাত্র ইতিবাচক নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশটি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাল কাজের জন্য যেসব নির্দেশ দেবেন তার সবগুলোর আনুগত্য করা হবে। অন্যায় ও পাপ কাজ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় জাহেলী যুগের মহিলারা বড় বড় যেসব অন্যায় ও গোনাহর কাজে জড়িত ছিল তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু ভাল কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার কোন ফিরিস্তি দিয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি যে, তোমরা অমুক অমুক কাজ করবে বরং শুধু এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, নবী (সা) ভাল কাজ করার জন্য যে নির্দেশই দিবেন তোমাদেরকে তার আনুগত্য করতে হবে। এখন এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন কেবল তাই যদি ভাল কাজ, হতো তাহলে প্রতিশ্রুতি নেয়া উচিত ছিল এই ভাষায় যে, তোমরা আল্লাহর নাফরমানী করবে না অথবা তোমরা কুরআনের নির্দেশসমূহ অমান্য করবে না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি যখন এই ভাষায় নেয়া হয়েছে যে, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেক কাজের জন্য যে, নির্দেশই দেবেন তোমরা তা লংঘন করবে না"। সুতরাং আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়ায় সমাজ সংস্কারের জন্য নবীকে (সা) ব্যাপক ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং তাঁর সব নির্দেশই অবশ্য পালনীয়—কুরআন মজীদে তার উল্লেখ থাক বা না থাক।

আইনগত এই ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের ওপর ভিত্তি করেই বাইয়াত গ্রহণের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎকালীন আরব সমাজের মহিলাদের মধ্যে প্রসার লাভ করা বহুসংখ্যক অন্যায় ও পাপকাজ পরিত্যাগ করার জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং এমন কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন যার উল্লেখ কুরআন মজীদে নেই। এ বিষয়ে জানার জন্য নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো দেখুন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা), উম্মে সালামা (রা) এবং উম্মে আতিয়া আনসারিয়া প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিতেন যে, তারা মৃতদের জন্য বিলাপ করে কাঁদবে না। বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী এবং ইবনে জারীর এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বিস্তারিত উল্লেখ আছে যে, নবী (সা) হযরত উমরকে (রা) মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ তাদের বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করবে। কারণ জাহেলী যুগে মহিলারা মৃতদের জন্য বিলাপ করে কাঁদত এবং পরিধেয় পোশাক ছিঁড়ে ফেলত, মুখমন্ডল খামচাত, চুল কেটে ফেলত এবং খুব বেশী চিৎকার ও হা-হুতাশ করত। (ইবনে জারীর)

যায়েদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেন ঃ নবী (সা) বাইয়াত গ্রহণের সময় মহিলাদেরকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন বিলাপ করে না কাঁদে, মুখমন্ডল না খামচায়, কাপড় না ছিঁড়ে, হা-হুতাশ ও আহাজারী না করে এবং কবিতা আবৃত্তি করে ইনিয়েবিনিয়ে না কাঁদে। (ইবনে জারীর) প্রায় অনুরূপ অর্থের একটি হাদীস ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে জারীর এমন একজন মহিলার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে নিজে বাইয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিল।

কাতাদা এবং হাসান বসরী বলেন ঃ নবী (সা) মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় যেসব প্রতিশ্রুতি নিতেন তার মধ্যে একটি ছিল তারা বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলবে না। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, বেগানা পুরুষদের সাথে নির্জনে, একা একা কথা বলবে না। কাতাদা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, নবীর (সা) একথা শুনে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! অনেক সময় এ রকম অবস্থা দেখা দেয় যে, আমরা বাড়ীতে থাকি না। কেউ হয়তো তখন সাক্ষাতের জন্য আমাদের কাছে আসে। তিনি বললেন ঃ আমি এ অবস্থা বুঝাতে চাইনি। অর্থাৎ "বাড়ীতে কেউ নেই", কোন আগন্তুককে এতটুকু কথা বলা মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। (ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন)

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার খালা উমাইমা (রা) বিনতে রুকাইকা থেকে হযরত আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) মহিলাদের থেকে এই মর্মে

প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, বিলাপ করে কাঁদবে না এবং জাহেলী যুগের মত সাজগোজ করে নিজেদের প্রদর্শন করবে না। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক খালা সালমা বিনতে কায়েস বলেন ঃ আমি বাইয়াতের জন্যে কয়েকজন আনসারী মহিলার সাথে তাঁর কাছে হাজির হলে তিনি কুরআনের এই আয়াত অনুসারে আমাদের থেকে বাইয়াত নিয়ে বললেন ঃ ولاتغششن ازواجكن "তোমাদের স্বামীর সাথে প্রতারণা করবে না।" ফিরে আসার মুহূর্তে এক মহিলা আমাকে বলল ঃ গিয়ে নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করো স্বামীর সাথে প্রতারণা করা বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

تَاخُذُ مَالَهُ فَتَحَابِّى بِهِ غَيْرَهُ

"স্বামীর টাকা পয়সা নিয়ে অন্যের জন্য ব্যয় করা।" (মুসনাদে আহমাদ)

উম্মে আতিয়া (রা) বলেন ঃ বাইয়াত গ্রহণের পর নবী (সা) আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমরা দুই ঈদের জামায়াতে হাজির হব। তবে জুময়ার নামায আমাদের জন্য ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতেও নিষেধ করলেন ।(ইবনে জারীর)

কিছু সংখ্যক লোক নবীর (সা) এই আইনগত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে তাঁর রিসালাতের পদবী বা মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত করার পরিবর্তে তাঁর ইমারতের পদবী ও মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত করেন। তারা বলেন, তিনি যেহেতু তাঁর সময়ের শাসকও ছিলেন, তাই এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে যেসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা শুধু তাঁর যুগ পর্যন্তই অবশ্য পালনীয় ছিল। যারা একথা বলেন, তারা অত্যন্ত মূর্খতাপূর্ণ কথা বলেন। নবীর (সা) যেসব নির্দেশ আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। এর মধ্যে নারী সমাজের সংস্কার ও সংশোধনের জন্য যেসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা যদি কেবল তদানীন্তন শাসক হিসেবেই তিনি দিতেন তাহলে চিরদিনের জন্য সারা দুনিয়ার মুসলিম সমাজের নারীদের মধ্যে এসব সংস্কার ও সংশোধন কি করে কার্যকর হতে পারতো? এ পৃথিবীতে এমন মর্যাদাবান কোন শাসক আছেন কি যে, একবার মাত্র তাঁর মুখ থেকে একটি নির্দেশ জারী হয়েছে আর সংগে সংগে গোটা দুনিয়ার যেখানে যেখানে মুসলিম জনবসতি আছে সেখানকার মুসলমান সমাজে চিরদিনের জন্য সেই সংস্কার ও সংশোধন জারী হয়ে গিয়েছে যা জারী করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হাশর, টীকা ১৫)

২৩. কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ছিল। পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি ছিল এই যে, বাইয়াত গ্রহণকারী নবীর (সা) হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করত। কিন্তু মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি কখনো তাঁর হাত দিয়ে কোন মহিলার হাত ধরেননি বরং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে তা আমরা নীচে বর্ণনা করছি ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ "আল্লাহর শপথ, বাইয়াত গ্রহণের সময় নবীর (সা) হাত কোন মহিলার হাতকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি মুখে শুধু একথাটুকু বলতেন যে, আমি তোমার থেকে বাইয়াত নিয়েছি"। (বুখারী, ইবনে জারীর)

"উমাইমা বিনতে রুকাইকা বলেন ঃ আমি আরো কয়েকজন মহিলার সাথে বাইয়াতের জন্য নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলে তিনি কুরআনের এই আয়াতের নির্দেশ অনুসারে আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। যখন আমরা বললাম ঃ মা'রূফ বা ভাল কাজে আমরা আপনার নাফরমানী করব না"। তখন তিনি বললেনঃ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاطَقْتُنَّ "যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ও সাধ্যে কুলাবে।" আমরা বললাম ঃ আমাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী দয়াপরবশ।" তারপর আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল, হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনার হাতে বাইয়াত করব। তিনি বললেনঃ আমি মহিলাদের সাথে মোসাফাহা করি না। আচ্ছা, আমি তোমাদের থেকেও প্রতিশ্রুতি নেব। সুতরাং তিনি আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। আর একটি হাদীসে তাঁর বর্ণনা হলো, নবী (সা) আমাদের মধ্যকার কোন মহিলার সাথেই মোসাফাহা করলেন না। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম)।

আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' গ্রন্থে শা'বী থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় নবীর (সা) দিকে একখানা কাপড় এগিয়ে দেয়া হলো। তিনি শুধু তা হাতে নিলেন এবং বললেন ঃ আমি মহিলাদের সাথে মোসাফাহা করি না। ইবনে আবী হাতেম শা'বী থেকে, আবদুর রায্যাক নাখায়ী থেকে এবং সায়ীদ ইবনে মনসূর কায়েস ইবনে আবী হাযেম থেকে প্রায় একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ইসহাক মাগাযীতে আবান ইবনে সালেহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় নবী (সা) পানির একটি পাত্রে নিজের হাত ডুবাতেন এবং মহিলারাও সেই একই পাত্রে হাত ডুবাতো।

বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদের খুতবা দেয়ার পর নবী (সা) পুরুষদের কাতারের মধ্যে দিয়ে মহিলারা যেখানে বসে ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে বক্তৃতা করার সময় তিনি কুরআন মজীদের এ আয়াতটি পড়লেন। তারপর মহিলাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো? সমাবেশের মধ্যে থেকে এক মহিলা জবাব দিল হাঁ, হে আল্লাহর রসূল, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর এবং বায্যার প্রমুখের একটি রেওয়ায়াতে উম্মে আতিয়া আনসারিয়ার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে ঃ নবী (সা) ঘরের বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমরা ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এ বক্তব্য থেকে একথা বুঝা যায় না যে, মহিলারা তাঁর সাথে মোসাফাহাও করেছিল। কেননা, হযরত উম্মে আতিয়া মোসাফাহা করার কথা স্পষ্ট করে বলেননি। সম্ভবত সে সময় অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিশ্রুতি গ্রহণের সময় নবী (সা) বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকবেন এবং ভেতর থেকে মহিলারাও প্রত্যেকে তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকবে। কিন্তু তাদের কারো হাতই রসূলুল্লাহর (সা) হাত স্পর্শ করেনি।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

হে ঈমানদারগণ, যাদের ওপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আখেরাত সম্পর্কে তারা ঠিক তেমনি নিরাশ যেমন কবরস্থ কাফেরা নিরাশ।[২৪]

২৪. মূল ইবারত হলো ঃ

قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ –

এর দু'টি অর্থ হতে হতে পারে। একটি হলো, তারা আখেরাতের কল্যাণ ও সওয়াব থেকে ঠিক তেমনি নিরাশ হয়ে গিয়েছে যেমন আখেরাত অস্বীকারকারীরা তাদের কবরস্থ মৃত আত্মীয়–স্বজনদের পুনরায় জীবিত করে উঠান সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত হাসান বসরী, কাতাদা এবং দাহহাহ (র) এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অর্থটি হতে পারে, তারা আখেরাতের রহমত ও মাগফিরাত থেকে ঠিক তেমনি নিরাশ যেমন কবরে পড়ে থাকা কাফেররা সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ, কালবী, মুকাতিল ও মনসূর রাহিমাহুমুল্লাহ থেকে এ অর্থটি বর্ণিত হয়েছে।